রাষ্ট্রক্ষমতার উত্থান-পতনে আল্লাহ তাআলার ভূমিকা

অধ্যাপক গোলাম আযম

রাষ্ট্রক্ষমতার উত্থান-পতনে আল্লাহ্ তাআলার ভূমিকা

অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড

www.pathagar.com

নবম মুদ্রণ : জুন ২০১২
অষ্টম মুদ্রণ : জুলাই ২০০৯
প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০২

রাষ্ট্রক্ষমতার উত্থান-পতনে আল্লাহ্ তাআলার ভূমিকা ❖ অধ্যাপক গোলাম আযম ❖ প্রকাশক: মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড়, ৫১, ৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০। ফোন ০১৭১১৫২৯২৬৬ ❖ স্বত্ব : লেখক ❖ মুদ্রণ :পিএ প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০।

বিক্রয়কেন্দ্র
৫১, ৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯০
৪২৩ ওয়ারলেস রেল গেট, মগবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯১
৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯২
কাঁটাবন মসজিদ মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯৩

নির্ধারিত মূল্য : আট টাকা মাত্র

www.pathagar.com

রাষ্ট্রক্ষমতার উত্থান-পতনে আল্লাহ তাআলার ভূমিকা

আল্লাহ তাআলা গোটা কুরআন মাজীদের বহু আয়াতে দাবি করেছেন যে, একমাত্র তিনিই আসমান ও জমিনের সব কিছুর স্থায়ীভাবে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। যে যত ক্ষমতার বড়াই করুক এবং ক্ষমতার যত দাপটই দেখাক, কারো ক্ষমতাই নিরঙ্কুশ ও চিরস্থায়ী নয়। ক্ষমতাসীনদেরকে অন্যায়-অবিচারের একটা সীমা পর্যন্ত তিনি সহ্য করেন। ঐ সীমা লঙ্ঘন করলে ক্ষমতা কেড়ে নেন।

তিনি মানুষের জন্য দুনিয়ার জীবনটাকে পরীক্ষার ময়দান বানিয়েছেন। ধনী-গরীব, সবল-দুর্বল, শাসক-শাসিত, নারী-পুরুষ সবাই নিজ নিজ অবস্থানে পরীক্ষা দিচ্ছে। যার যা করা উচিত তা করছে কিনা এবং যা করা উচিত নয় তা থেকে বিরত রয়েছে কিনা, এর যথাযথ রেকর্ড রাখার ব্যবস্থা তিনি করেছেন। এর ভিত্তিতেই তিনি আখিরাতে পুরস্কার ও শাস্তি দেবেন। দুনিয়ায় তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত স্বাধীনভাবে চলার অবকাশ দিয়েছেন। ঐ সীমা লঙ্ঘন করলে দুনিয়াতেই তিনি পাকড়াও করেন। দুনিয়াতে শাস্তি দেন না; এরেস্ট করেন মাত্র, যাতে আর অন্যায় করতে না পারে।

এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো, রাষ্ট্রক্ষমতার উত্থান-পতনে আল্লাহ তাআলার কোনো ভূমিকা আছে কিনা। এ বিষয়ে কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ২৬ নং আয়াতের ভিত্তিতে আলোচনা শুরু করতে চাই–

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

"(হে নবী!) বলুন, রাজত্বের মালিক হে আল্লাহ! তুমি যাকে চাও তাকেই রাজত্ব দান কর, আর যার কাছ থেকে ইচ্ছা কর রাজত্ব কেড়ে নাও এবং যাকে চাও সম্মান দান কর, আর যাকে চাও অপমানিত কর।" (সূরা আলে ইমরান : ২৬)

এখানে আল্লাহ তাআলা দাবি করেছেন যে, সকল রাষ্ট্রক্ষমতার লাগাম তাঁরই হাতে রয়েছে। তিনিই সকল রাষ্ট্রক্ষমতার আসল মালিক। তিনি যাকে চান ক্ষমতা দেন, যার কাছ থেকে ইচ্ছা করেন ক্ষমতা কেড়ে নেন। যাকে চান ইজ্জত দেন, যাকে চান অপমানিত করেন।

এ কথা দ্বারা কী বোঝায়? আল্লাহ তাআলা কি ক্ষমতার উত্থান-পতনে সরাসরি হস্তক্ষেপ করেন? করলে কিভাবে তা করেন? এটা কি তাঁর খামখেয়ালী কোনো কারবার, নাকি এমন কোনো নিয়ম-নীতি রয়েছে, যা প্রয়োগ করে তিনি ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করেন?

পৃথিবীতে চিরকালই ক্ষমতার লড়াই চলছে। গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচনী লড়াই চলে। রাজতন্ত্রেও প্রাসাদে ষড়যন্ত্র হয় এবং ক্ষমতার রদবদল হয়। স্বৈরতন্ত্রে নির্বাচনের নামে প্রহসন চলে। কোথাও সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করা হয়। কোনো

www.pathagar.com

এলাকায় পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েমের আন্দোলন সফল হলে ক্ষমতার পরিবর্তন হয়। ক্ষমতার উত্থান-পতন বিচিত্র রূপে ঘটে থাকে।

আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো, এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার কোনো ভূমিকা আছে কিনা। থাকলে এর রূপ কী? যদি না থাকে তাহলে তিনি উপরিউক্ত আয়াতে এমন দাবি করলেন কিভাবে?

বিশ্ব পরিচালনায় আল্লাহ তাআলার ভূমিকা

মহাবিশ্বে এক কঠোর নিয়মের রাজত্ব বিরাজ করছে। এটম থেকে সূর্য পর্যন্ত, ক্ষুদ্র ঘাস থেকে প্রকাণ্ড বৃক্ষ পর্যন্ত, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না এমন জীবাণু থেকে বিশালদেহী পশু পর্যন্ত, সব কিছুর মধ্যেই এমন সব নিয়ম-নীতি চালু রয়েছে, যা চিরকাল একই রূপে ক্রিয়াশীল। আগুন, পানি, বাতাস, গ্যাস ইত্যাদিতে নির্দিষ্ট নিয়ম না থাকলে আমরা এসবকে ব্যবহার করতে পারতাম না। মানবদেহে যেসব সূক্ষ্ম বিধি-বিধান রয়েছে, তা একই নির্দিষ্ট ধরনের না হলে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিকাশ সাধন সম্ভব হতো না। মহাশূন্যে গ্রহ-উপগ্রহ নির্দিষ্ট বিধান মেনে না চললে চন্দ্র ও মঙ্গল গ্রহে অভিযানই সম্ভব হতো না। একই নিয়মে ফল-ফসল উৎপন্ন না হলে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা অচল হয়ে যেত।

বিজ্ঞান গবেষণার যত উন্নতি হচ্ছে ততই ঐ কঠোর নিয়মের অস্তিত্ব স্বীকার করতে মানুষ বাধ্য হচ্ছে। ঐসব নিয়মকে Law of Nature (প্রাকৃতিক বিধান) বলা হয়। এ বিধানের কোনো সামান্য অংশে রদবদলের সাধ্য কি কারো আছে? বিশ্বের সকল বৈজ্ঞানিকের সমবেত চেষ্টায় কি ঐসব বিধানের কোনোটি রহিত করা বা কোনো নতুন বিধি সংযোজন করা সম্ভব? যদি সম্ভব না হয় তাহলে কীভাবে এমন চমৎকার বিধি-বিধান চিরকাল একইভাবে চালু আছে? বিনা পরিকল্পনায় দুর্ঘটনাক্রমে কি এমন কঠোর নিয়মের রাজত্ব চলতে পারে?

এ কারণেই বড় বড় বিজ্ঞানীরা এ নিয়মের রাজত্বের পেছনে এক মহা-পরিকল্পনাকারী ও মহাকুশলী সত্তাকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। সত্যিকার বিজ্ঞানীর নাস্তিক হওয়া কঠিন। দার্শনিকদের মধ্যেই নাস্তিক পয়দা হয়। বৈজ্ঞানিকরা প্রাকৃতিক বিধি-বিধানের পরিবর্তনীয় অবস্থা দেখে স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, অবশ্যই কোনো এক অলৌকিক পরিকল্পনাকারী শক্তি এসবের পেছনে ক্রিয়াশীল রয়েছে।

গত পঞ্চাশের দশকে 'The Evidence of God in an Expanding Universe' নামে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ৪০ জন প্রখ্যাত আমেরিকান বিজ্ঞানীর লেখা সংকলনটি পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। ফ্রাঙ্কলিন পাবলিকেশন্স 'আল্লাহর অস্তিত্ব : ৪০ জন বৈজ্ঞানিকের সাক্ষ্য' নামে এ বইটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছিল।

লেখকগণ বিজ্ঞানের নিজ নিজ শাখায় প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার যুক্তি পেশ করে ঘোষণা করেছেন যে, God-ই একমাত্র ঐ পরিকল্পনাকারী শক্তি, বিনি Laws of Nature তথা প্রকৃতির নিয়মাবলি-এর স্রষ্টা, নিয়ন্ত্রক ও কর্তা।

www.pathagar.com

মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও পরিচালক হিসেবে কুরআনে আল্লাহর ঘোষণা

কুরআন মাজীদে অগণিত আয়াতে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিজগতের কথা বিভিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন। আসমান-জমিন, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর, গ্রহ-তারা, চন্দ্র-সূর্য, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, আগুন-পানি, আলো-বাতাস, দিবা-রাত্রি, মেঘ-বৃষ্টি ইত্যাদির উল্লেখ করে দাবি করেছেন যে, তিনিই এসব সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই দেওয়া বিধি-বিধান সবাই বাধ্য হয়ে মেনে চলে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণস্বরূপ অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় বারবার তাঁর সৃষ্টিলোকের বিভিন্ন সৃষ্টবস্তু ও জীবের কথা উল্লেখ করে দাবি করেছেন যে, তিনিই একমাত্র মহাবিজ্ঞানী, মহাকুশলী, মহাব্যবস্থাপক, মহাপরিচালক ও মহাপরিকল্পনাকারী সত্তা, যাঁর জারি করা বিধি-বিধান মেনে চলতে সবাই বাধ্য। তাঁর দেওয়া বিধান ছাড়া গাছের কোনো পাতাও নড়ে না, কোনো বীজও গজায় না, কোনো পাখিও উড়ে না। মহাশক্তিমান সূর্য তাঁরই নির্ধারিত কক্ষপথে একই নিয়মে চলতে বাধ্য। দিন ও রাত একই বিধি মেনে আসে ও যায়। গোটা বিশ্বে তিনিই একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। কোনো সত্তারই এতে সামান্য অংশীদারিত্বও নেই।

কুরআনে আল্লাহর বলার স্টাইল

যেহেতু বিশ্ব চরাচরে যা কিছু ঘটছে একমাত্র আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী ঘটে থাকে, সেহেতু আল্লাহ তাআলা থার্ড পারসনে যেমন বলেছেন, ফার্স্ট পারসনেও বহু আয়াতে বলেছেন। থার্ড পারসনের চেয়ে ফার্স্ট পারসনে বলার মধ্যে বলিষ্ঠতাই প্রকাশ পায়। যেমন–

১. আল্লাহর রচিত নিয়মেই বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং এর ফলেই গাছ-পালা জন্মে। এ কথাটিকে তিনি ফার্স্ট পারসনে এভাবে বলেন,

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ـ

"আমিই আকাশ থেকে পানি নাযিল করি এবং (জমিনে) সব রকম উপকারী ফসল ফলাই।" (লুকমান ঃ ১০)

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيدِ ـ

"আমিই আসমান থেকে বরকতময় পানি নাযিল করেছি, তারপর তা দিয়ে বাগান-ফসলাদি জন্মিয়েছি।" (সূরা কাফ : ৯)

২. চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারায় সাজানো আকাশ সম্পর্কে তিনি বলেন,

وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ ۨالْكَوَاكِبِ ـ

"আমিই পৃথিবীর (নিকবর্তী) আকাশকে সুসজ্জিত তারকারাজি দ্বারা সাজিয়ে দিয়েছি।" (সূরা সাফফাত : ৬)

www.pathagar.com

وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ـ

"আমিই পৃথিবীর (নিকবর্তী) আকাশকে বাতিসমূহ দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছি।" (সূরা হা-মীম সাজদাহ : ১২)

৩. আসমান-জমিন তাঁরই সৃষ্টি। এ সম্পর্কে তিনি বলেন,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ـ

"আমিই আসমানসমূহ ও জমিন এবং এ দুয়ের মধ্যে যা কিছু আছে (সবই) পয়দা করেছি।" (সূরা কাফ : ৩৮)

মানুষের হেদায়াত হওয়া ও গুমরাহ হওয়া সম্পর্কে আল্লাহর বক্তব্য

আল্লাহ তাআলা মানুষকে ঈমান আনতে যেমন বাধ্য করেন না, তেমনি গুমরাহ হতেও বাধ্য করেন না। এ বিষয়ে মানুষকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ইখতিয়ার তিনি দিয়েছেন। কিন্তু হেদায়াত পাওয়া না পাওয়ার উপায় ও পন্থা তিনিই সৃষ্টি করেছেন।

মানুষকে তিনি ভালো ও মন্দ বোঝার যোগ্যতা দিয়েছেন। তাকে যুক্তি ও বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষমতা দিয়েছেন। নিরপেক্ষ মনে বিচার-বিবেচনা করার অধিকারও তিনি দিয়েছেন। যদি এসব যোগ্যতা, ক্ষমতা ও অধিকার প্রয়োগ করে কেউ অসত্য থেকে সত্যকে এবং বেঠিক থেকে সঠিককে বাছাই করতে চেষ্টা করে তাহলে অবশ্য সে হেদায়াত পায়। কিন্তু কেউ যদি ব্যক্তিস্বার্থ ও হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে তার ঐসব যোগ্যতা, ক্ষমতা ও অধিকারকে প্রয়োগ না করে তাহলে সে সত্যকে বাছাই করতে ব্যর্থ হয়; এমনকি সত্যকে চিনেও গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না।

হেদায়াত ও গুমরাহী হাসিলের এ নিয়ম আল্লাহরই রচিত। তাই আল্লাহ বলেন,

فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

"আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন গুমরাহ করেন এবং যাকে চান হেদায়াত দেন। তিনিই শক্তিমান ও সুকৌশলী।" (সূরা ইবরাহীম : ৪)

যদি আল্লাহ কাউকে গুমরাহ করেন তাহলে সে অপরাধী হবে কেন এবং এর জন্য শাস্তিই বা পাবে কোন্ যুক্তিতে? তেমনিভাবে যদি আল্লাহ হেদায়াত করার কারণেই কেউ সুপথ পেয়ে থাকে তাহলে এতে তার কী কৃতিত্ব থাকতে পারে এবং এর জন্য সে পুরস্কারের অধিকারী কেন হবে?

অথচ আল্লাহ হেদায়াতপ্রাপ্তদের পুরস্কার দেবেন এবং গুমরাহদের শাস্তি দেবেন বলে বারবার ঘোষণা করেছেন। এ দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, হেদায়াত ও গুমরাহ হওয়ার নিয়ম তিনি তৈরি করেছেন বলেই এভাবে বলেছেন। এটা আল্লাহর কথা বলার বিশেষ স্টাইল।

www.pathagar.com

কাফিরের দিলে মোহর মারা প্রসঙ্গ

সূরা বাকারার প্রথম রুকুতে আল্লাহ্ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۔ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۔

"যারা এসব কথা মানতে অস্বীকার করেছে (হে নবী!) তাদেরকে আপনি সাবধান করুন আর নাই করুন তাদের জন্য দু-ই সমান। কোনো অবস্থায়ই তারা ঈমান আনবে না। আল্লাহ্ তাদের মন ও কানে মোহর মেরে দিয়েছেন আর তাদের চোখে পর্দা পড়ে গেছে। তাদের জন্য কঠিন আযাব রয়েছে।" (সূরা বাকারাহ : ৬-৭)

এ আয়াত দুটি থেকে কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আল্লাহ্ নিজেই যখন তাদের দিলে ও কানে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং চোখ পর্দা দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন, তখন তাদের হেদায়াত পাওয়ার সব পথই বন্ধ হয়ে গেল। দেখার, শোনার ও বিবেচনা করার শক্তি রহিত হয়ে যাওয়ার পর তারা কুফরীতে লিপ্ত থাকার জন্য তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় কী করে?

আল্লাহর কথা বলার স্টাইল না বোঝার কারণে এ রকম ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। তাদের দিলে মোহর মারার কারণে তারা কুফরীতে নিমজ্জিত হয়নি; বরং তারা কুফরী করার ফলেই অন্তরে মোহর মারা হয়েছে। অর্থাৎ তারা তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক ও দেখা-শোনার শক্তিকে কাজে না লাগিয়ে এবং নবীর দাওয়াতকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন না করেই তা মানতে অস্বীকার করার কারণে তাদের দিলে মোহর লেগে গেছে।

একটি সহজ উদাহরণ দিয়ে মাওলানা মওদূদী (র) এ কথাটি চমৎকার করে ব্যাখ্যা করেছেন। একই মানের ইস্পাত দিয়ে দুটো ছুরি তৈরি করে একটি নিয়মিত ব্যবহার করা হলেও অপরটিকে ব্যবহার না করে ফেলে রাখা হলে স্বাভাবিকভাবে একটিতে মরিচা ধরবে না, অন্যটিতে মরিচা ধরবে। যেটা ব্যবহার না করে ফেলে রাখা হয়েছে ওটাতেই মরিচা ধরবে।

প্রশ্ন হলো, মরিচা ধরার কারণে ব্যবহার করা হচ্ছে না, নাকি ব্যবহার না করার কারণে মরিচা ধরেছে? সবাই বলবে যে, ব্যবহার না করার ফলেই মরিচা ধরেছে।

ঠিক তেমনি বিবেক-বুদ্ধি-বিবেচনা শক্তিকে ব্যবহার না করার ফলেই দিলে মোহর পড়ে গেছে। প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহ্ এভাবে বললেই তো পারতেন যে, তাদের দিলে মোহর লেগে গেছে কুফরীতে লিপ্ত থাকার কারণে কিংবা ঈমান আনতে অস্বীকার করার পরিণামে মোহর লেগেছে।

আল্লাহর বলার স্টাইল বুঝতে হবে

ছুরিটা ব্যবহার না করে ফেলে রাখলে এতে মরিচা ধরার বিধান কে বানাল? আল্লাহর রচিত নিয়মেই মরিচা ধরে। যেহেতু এ নিয়মটা আল্লাহরই তৈরি, সেহেতু আল্লাহ্ বলতে পারেন, "আমিই মরিচা ধরিয়ে দিয়েছি।" এটাই আল্লাহ্ তাআলার বলার একটা স্টাইল।

www.pathagar.com

যে বিচার-বিবেচনার পরওয়া না করে নবীর দাওয়াতকে মানতে অস্বীকার করে বসল, তার দিলে আল্লাহরই তৈরি নিয়মে মোহর লেগে গেল। এ নিয়মটা আল্লাহরই রচিত বলে আল্লাহ তাআলা নিজস্ব স্টাইলে ঐভাবে বলেছেন।

আল্লাহর কথা বলার এ স্টাইল বুঝতে পারলে ক্ষমতার উত্থান-পতনের ব্যাপারে সূরা আলে ইমরানের ঐ কয়টি আয়াতের মর্ম বুঝতে কোনো সমস্যা দেখা দেয় না। অবশ্য ক্ষমতার লড়াইয়ে জয়-পরাজয়ের ব্যাপারে আল্লাহর রচিত বিধান কী, সে প্রশ্ন তোলা যায়। ক্ষমতার উত্থান-পতনে আল্লাহর দেওয়া শাশ্বত নিয়ম-নীতি কী, যা বাস্তবে চালু আছে? আল্লাহর দেওয়া বিধি অনুযায়ী ক্ষমতার রদবদল হয় বলেই আল্লাহর নিজস্ব স্টাইলে তিনি ঐভাবে বলেছেন।

ক্ষমতার রদবদলে আল্লাহর বিধান

দুনিয়ায় যেসব নিয়মে ক্ষমতার রদবদল হচ্ছে, সেসব মানবসমাজে কীভাবে চালু হয়েছে, তা গবেষণার বিষয়। মানবসমাজের বিবর্তনে শাসনক্ষমতার অধিকারী কে বা কারা হবে, সে বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম একইভাবে সবদেশে, সবকালে চালু ছিল না। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা সমাজ-বিজ্ঞানীরা আলোচনা করতে গিয়ে অনেক কল্প-কাহিনীরও জন্ম দিয়েছেন।

ঐতিহাসিক যুগের ঘটনাবলি থেকে ক্ষমতার উত্থান-পতনের ব্যাপারে একটা নিয়মই স্পষ্ট দেখা যায়। কোনো সাহসী নিপুণ বীর যোদ্ধা একটি সামরিক শক্তি সংগঠিত করে ক্ষমতাসীনদের থেকে শক্তিবলে ক্ষমতা দখল করে। সে ক্ষমতায় স্থায়ী হওয়ার জন্য প্রতিপক্ষ হিসেবে কোনো শক্তি তার এলাকায় গড়ে ওঠতে দেয় না। কিন্তু কোনো বিকল্প শক্তি তাকে পরাজিত করতে পারলে ক্ষমতার পরিবর্তন হয়।

ক্ষমতাসীন হয়ে ক্ষমতা সুসংহত করতে সক্ষম হলে বংশীয় রাজত্বও চলে। বংশীয় বা গোত্রীয় শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে ধর্মকেও ব্যবহার করা হয়েছে। কোনো কোনো নয়া শাসকগোষ্ঠীর মধ্যেও কোন্দলের ফলে ক্ষমতা বদল হয়েছে।

যতভাবেই ক্ষমতার পরিবর্তন হোক শেষ পর্যন্ত ক্ষমতার লড়াইতে শক্তি দ্বারাই চূড়ান্ত মীমাংসা হয়। শাসনক্ষমতা শক্তি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। Might is Right.

ক্ষমতালাভের প্রতিযোগিতায় জয়-পরাজয় যে শাশ্বত নিয়মে চলে তা হলো–

১. যেদিকে জনসংখ্যা বেশি থাকে, তারা অল্প লোকের উপর জয়ী হয়।

২. যে পক্ষে উন্নতমানের অস্ত্র থাকে, তারা নিম্নমানের অস্ত্রধারীকে পরাজিত করে ক্ষমতা দখল করে।

৩. উন্নত রণকৌশলের কারণেও প্রতিপক্ষের উপর জয়ী হওয়া যায়।

৪. সাহসী, ডানপিটে, দৃঢ়চিত্ত পক্ষ কম সাহসীদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়।

৫. ষড়যন্ত্রকারী, চালাক, ধুরন্ধর লোকেরা সরলমনাদেরকে পরাজিত করে।

৬. বংশীয় রাজতন্ত্র শক্তিবলে কায়েম রাখা যায়– যতদিন জনগণের সমর্থন ভোগ করা সম্ভব হয়। জনগণ সন্তুষ্ট থাকলে প্রতিরোধ শক্তি গড়ে উঠতে পারে না।

www.pathagar.com

৭. ক্ষমতাসীন শক্তি যদি জুলুম-নির্যাতনের সীমা লঙ্ঘন করে তাহলে জনগণকে রক্ষা করার জন্য প্রতিরোধ শক্তি গড়ে ওঠে। এর ফলে হয় ক্ষমতাসীনরা সংশোধন হয়, আর না হয় প্রতিপক্ষ জনসমর্থনের জোরে ক্ষমতা দখল করে।

এ নিয়মটা সম্পর্কে কুরআনে এভাবে বলা হয়েছে–

وَلَوْ لاَ دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ-

"যদি আল্লাহ তাদের (মানুষের) কতক লোককে অন্য কতক লোক দ্বারা দমন না করতেন তাহলে পৃথিবীতে নিশ্চিতভাবেই বিশৃঙ্খলা বিরাজ করতো।" (সূরা বাকারা : ২০১)

৮. গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা পরিবর্তনের ব্যবস্থায়ও—

ক. যে দলের পক্ষে বেশি সংখ্যায় ভোট পড়ে তারাই ক্ষমতা পায়।

খ. কারচুপি, জালভোট, ব্যালট ডাকাতি করেও নির্বাচনে জয়ী হওয়া সম্ভব।

গ. স্বৈরশাসকরা নির্বাচনী প্রহসন করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে।

এ জাতীয় যত প্রকার বিধি অনুযায়ী ক্ষমতার উত্থান-পতন ঘটে তা আল্লাহরই সৃষ্টি। ক্ষমতার রদবদলে এসব নিয়মের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা অলৌকিকভাবে হস্তক্ষেপ করেন না। কিন্তু যেহেতু এসব নিয়ম তাঁরই সৃষ্ট, সেহেতু তিনি তাঁর নিজস্ব স্টাইলে দাবি করেন, "আমিই ক্ষমতায় বসাই, আমিই ক্ষমতা কেড়ে নিই।"

আল্লাহর বলার এ স্টাইলের নমুনা ইতঃপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন– ছুরিতে আমিই মরিচা ধরাই, কাফিরের দিলে আমিই মোহর মেরে দিই। আমিই হেদায়াত দিয়ে থাকি। আমিই বৃষ্টি বর্ষণ করি। আমিই মৃত জমিকে জীবিত করি। আমিই ফসল ফলাই। আমিই সন্তান দেই। আমিই হাসাই, আমিই কাঁদাই।

ক্ষমতার হাত বদলে আল্লাহর সূক্ষ্ম ভূমিকা

আল্লাহ তাআলা উল্লিখিত বিভিন্ন নিয়মে ক্ষমতার উত্থান-পতন ঘটতে দেন। সাধারণত এসব বিষয়ে তিনি সরাসরি কোনো পক্ষ অবলম্বন করেন না। তবে তিনি নিশ্চয়ই সূক্ষ্মভাবে এমন ভূমিকা পালন করেন, যাতে অন্যায় ও জুলুমের শেষ সীমা কেউ লঙ্ঘন করতে না পারে।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে যে চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা দিয়েছেন, তা সীমাহীন নয়। ব্যক্তিজীবনে যেমন একটা সীমা পর্যন্ত তিনি অন্যায় করার অবকাশ দিলেও ঐ সীমা লঙ্ঘন করলে তিনি সহ্য করেন না এবং তাকে পাকড়াও করেন, তেমনি সামষ্টিক জীবনেও ক্ষমতাসীনদেরকে তাঁর দেওয়া সীমা লঙ্ঘন করলে তাদের জুলুম থেকে জনগণকে রক্ষার ব্যবস্থা করেন।

মানুষের মন আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণে। যখন তিনি হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন মনে করেন, তখন তিনি তাঁর ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার জন্য মানুষের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করেন। এ জাতীয় সূক্ষ্ম ভূমিকার ব্যাখ্যা করাও মানুষের সাধ্যের বাইরে।

www.pathagar.com

১৯৭১ ও '৭২ সালে শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে ছিল। '৭৫-এ নির্মমভাবে সপরিবারে নিহত হওয়ার খবর শুনে ঐ জনগণই এমন স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাস প্রকাশ করেছে, যা বিশ্বকে বিস্মিত করে।

১৯৯৬-এর নির্বাচনে পাকিস্তানে নওয়াজ শরীফের বিরাট বিজয় তার জনপ্রিয়তার যে সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করে, ১৯৯৯ সালে তার পতনে জনগণ সামান্য অসন্তুষ্ট হয়েছে বলেও বোঝা গেল না।

২০০০ সালের নভেম্বরে আমেরিকার নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবার দায়িত্ব যখন ফেডারেল সুপ্রিম কোর্টের ৯ জন বিজ্ঞ বিচারপতির হাতে ন্যস্ত হলো, তখন তাদের মনের উপর আল্লাহ্ তাআলা কোনো প্রভাব বিস্তার করেছেন কিনা জানার উপায় নেই।

আলগোরের রানিং মেট একজন কট্টর ইহুদী ছিল। আলগোর বিজয়ী হলে সে ভাইস-প্রেসিডেন্ট হতো। আমেরিকায় প্রায়ই ভাইস-প্রেসিডেন্ট একসময় প্রেসিডেন্ট হয়। আমেরিকার নেতৃত্বে সব সময়ই ইহুদী প্রভাব রয়েছে। তবু কোনো ইহুদী সরাসরি ক্ষমতায় আসুক এটা হয়তো আল্লাহ্ চাননি।

এসব কথা দ্বারা এ বিষয়টিই আমি তুলে ধরতে চাই যে, ক্ষমতার উত্থান-পতনে আল্লাহ্ একটা বিশেষ সীমা পর্যন্ত নিরপেক্ষ থাকলেও যখনই প্রয়োজন বোধ করেন, হস্তক্ষেপ করেন। অবশ্য মানুষের পক্ষে তা উপলব্ধি করা সম্ভব নাও হতে পারে। এ পৃথিবীটা তিনি স্থায়ীভাবে কোনো শক্তির হাতে ইজারা দেননি।

আল্লাহর রাজত্ব কায়েমের ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা

ইতঃপূর্বে আলোচনা হয়েছে যে, ক্ষমতার উত্থান-পতনের ব্যাপারে যত প্রকার বিধি-বিধান রয়েছে তা অবাধেই চালু থাকে। এতে আল্লাহ্ তাআলা সাধারণত হস্তক্ষেপ করেন না। তাই এর ব্যতিক্রম হতে দেখা যায় না। কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলা কোনো সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ করলেও তা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা মানুষের সাধ্যের বাইরে।

এখন প্রশ্ন হলো, আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করা বা আল্লাহর রাজত্ব কায়েমের উদ্দেশ্যে ইসলামী আন্দোলনের ক্ষমতাসীন হওয়ার ব্যাপারেও কি তিনি নিরপেক্ষই থাকেন? ইসলামবিরোধী শক্তির সাথে ইসলামী শক্তির লড়াইয়ে কি জয়-পরাজয়ের সাধারণ নিয়মই তিনি চলতে দেন, না তিনি সেখানে সরাসরি কোনো ভূমিকা পালন করেন?

আল্লাহর জমিনে তাঁরই আইন চালু থাকুক, এটাই তিনি পছন্দ করেন। কিন্তু তিনি নিজের উদ্যোগে তা করেন না। তাঁর সকল সৃষ্টির উপরই তিনি তাঁর তৈরি বিধান জারি করেন। ঐসব বিধান নবীর মাধ্যমে তিনি পাঠাননি। মানুষের জন্য নবীর মাধ্যমে যে বিধান তিনি পাঠিয়েছেন তা কায়েম করার দায়িত্ব নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান আনে তাদের উপর অর্পণ করেছেন। বিধান আল্লাহর– সে বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে জারি করার দায়িত্ব যারা পালন করেন, তারাই আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলীফার মর্যাদা পান।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তাআলা সরাসরি নিজের উদ্যোগে ঐ বিধান কায়েম না করলেও যারা তাঁর প্রতিনিধির দায়িত্ববোধ নিয়ে তা কায়েম করার চেষ্টা করে সর্বাবস্থায় তিনি তাদেরকে সাহায্য করেন। তিনি তাদেরকে তাঁর দল বা বাহিনীর (হিযবুল্লাহ) মর্যাদা দেন। তিনি কুরআনে তাঁর এ বাহিনীর বিজয়ের নিশ্চয়তা দিয়েছেন এভাবে–

أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ـ

"তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখো, অবশ্যই আল্লাহর দল বিজয়ী হবে।" (সূরা মুজাদালাহ : ২২)

আল্লাহর বাহিনীর বিজয়ের আসল শর্ত

আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার আন্দোলনে নিয়োজিত বাহিনীর বিজয়ের আসল শর্ত হলো আল্লাহর সাহায্য। তিনি নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ـ

"হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে (আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করতে) সাহায্য কর, তাহলে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদমকে মযবুত করে দেবেন।" (সূরা মুহাম্মাদ : ৭)

তিনি আরো বলেন– وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

"মুমিনদেরকে সাহায্য করা আল্লাহর উপর তাদের হক।" (সূরা রূম : ৪৭)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদেরকে সাহায্য করা তাঁর কর্তব্য মনে করেন। এটা আল্লাহর উপর মুমিনদের অধিকার।

আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী। তাঁকে পরাজিত করার মতো কোনো শক্তি নেই। তিনিই যদি সাহায্য করেন, তাহলে বিজয় অবশ্যই নিশ্চিত। তাঁর সাহায্য পাওয়ার যোগ্যতা যারা অর্জন করতে পারে তাদের পরাজয়ের কোনো আশঙ্কা নেই। ইরশাদ হচ্ছে,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ـ

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছ ও নেক আমল করেছ, তাদের নিকট আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি পৃথিবীতে তাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই খিলাফত কায়েমের সুযোগ দান করবেন।"

অর্থাৎ, মুমিনদের মধ্যে আল্লাহর দীনকে বাস্তবায়নের যোগ্য একদল লোক তৈরি হলে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে রাষ্ট্রক্ষমতায় পৌঁছিয়ে দেবেন। তাদের ক্ষমতা দখলের জন্য ব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। ক্ষমতায় পৌঁছানোর দায়িত্ব আল্লাহ্ নিজেই নিয়েছেন। কিন্তু একদল যোগ্য লোক তৈরি করার দায়িত্ব তিনি নেননি। এ দায়িত্ব নবীর ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান আনে তাদের।

www.pathagar.com

আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার শর্তাবলি

ইসলামী ও ইসলামবিরোধী শক্তির মধ্যে যে লড়াই চলে, তাতে আল্লাহ তাআলা নিরপেক্ষ থাকেন না। তিনি সব সময়ই ইসলামী শক্তির পক্ষে।

তাই ক্ষমতার উত্থান-পতনের জন্য তিনি যেসব নিয়ম-বিধি সবার জন্য দিয়েছেন, সেসব নিয়ম আল্লাহর সৈনিকদের জন্য মোটেই প্রযোজ্য নয়। তাদের জন্য তিনি পৃথক বিধান দিয়েছেন। যদি সে বিধান অনুযায়ী আল্লাহর বাহিনী ঠিকমতো চলে, তাহলে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় নিশ্চিত।

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের আন্দোলন ও বিজয়ের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, চারটি শর্ত যদি ইসলামী বাহিনী পূরণ করতে সক্ষম হয়, তাহলে আল্লাহর সাহায্য অনিবার্য।

১. প্রথম শর্ত হলো সহীহ বা খালেস নিয়ত। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সাফল্যের উদ্দেশ্যে ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় থাকতে হবে। দুনিয়ার কোনো সামান্য ব্যক্তিগত লাভের আশা ও ক্ষতির আশঙ্কা নিয়তের সাথে যাতে শামিল না হয়, সেদিকে চরমভাবে সতর্ক থাকতে হবে।

২. হক ও বাতিলের মধ্যে যখন সংঘর্ষ চলে, তখন হকের পতাকাবাহীদের সর্বদিক দিয়ে সাধ্যমতো পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। জনবল ও ধনবল যেটুকু আছে, তা আল্লাহর পথে সাধ্যমতো নিয়োজিত করতে হবে। প্রতিপক্ষের মুকাবিলায় যা কিছু প্রস্তুতি প্রয়োজন তা যথাসাধ্য গ্রহণ করতে হবে।

যতটুকু সাধ্যে কুলায়, সে পরিমাণ প্রস্তুতি গ্রহণ করা হলে বিরোধী দলের তুলনায় তা কম হলেও কোনো ক্ষতি নেই। আল্লাহ তাআলা এ কমতি সত্ত্বেও সাহায্য করবেন। তাই তিনি নির্দেশ দিয়েছেন,

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ ـ

"তোমাদের যতটুকু সাধ্যে কুলায় শক্তি সঞ্চয় কর এবং ঘোড়া সাজিয়ে তৈরি রাখ।" (সূরা আনফাল : ৬০)

'যতটুকু সাধ্যে কুলায়' কথাটি বড়ই অর্থবহ। আল্লাহর পথে জান ও মাল কুরবানীর যে নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন, তা তো মুমিন হিসেবে সবটুকুই আল্লাহর নিকট বিক্রয় করে দেওয়া হয়েছে। বেহেশতের বিনিময়ে যা বিক্রয় করে দেওয়া হলো, তার সবটুকুর মালিকানাস্বত্ব তো আল্লাহর হাতেই তুলে দেওয়া হয়েছে। সে জযবার ভিত্তিতেই সাধ্যমতো জান ও মালকে পেশ করতে হবে।

পূর্ণ প্রস্তুতি বলতে এ কথাও বোঝায় যে, দুশমনরা যেসব হাতিয়ার, উপায়-উপকরণ ও পন্থা অবলম্বন করে এর মুকাবিলা করার জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। এখানেও সাধ্যমতো চেষ্টার পর কমতি থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ সাহায্য করবেন।

www.pathagar.com

বদরের যুদ্ধে জনবল, অস্ত্রবল ও যানবাহনের দিক দিয়ে শত্রুপক্ষের তুলনায় তিন ভাগের একভাগ প্রস্তুতি সত্ত্বেও আল্লাহর সাহায্যে মুসলিমদের বিজয় সম্ভব হয়েছে। এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ـ

"এর আগে বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন; অথচ তোমরা তখন খুবই দুর্বল ছিলে।" (সূরা আলে ইমরান : ১২৩)

যদি আল্লাহর বাহিনী জয়ী না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, আল্লাহর সাহায্য আসেনি। সাহায্য না আসার অন্যতম কারণ 'সাধ্যমত' প্রস্তুতি'র অভাবও হতে পারে। সাধ্যের কম প্রস্তুতি হলে আল্লাহর সাহায্য নাও আসতে পারে। এ কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৩. একমাত্র আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করতে হবে। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো শক্তির উপর নির্ভর করলে তিনি সাহায্য করেন না। জনবল, সমরাস্ত্র, সমরকৌশল, সুবিধাজনক অবস্থান ইত্যাদি কোনোটাই ভরসার যোগ্য নয়। হুনাইনের যুদ্ধের ঘটনাই এর প্রমাণ। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে ঘোষণা করা হয়েছে–

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِىْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ـ

"এর আগে তোমাদেরকে আল্লাহ অনেক জায়গায় সাহায্য করেছেন। এই তো সেদিন হুনাইনের যুদ্ধে (তোমরা দেখলে); ঐ দিন তোমাদের সংখ্যা বেশি থাকায় তোমরা গর্ববোধ করেছিলে। কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি। জমিন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল এবং তোমরা পেছনে ফিরে পালিয়ে গেলে।" (সূরা তাওবাহ : ২৫)

হুনাইনের যুদ্ধ হয়েছিল মক্কা বিজয়ের পর। তখন মুসলিম বাহিনীর সর্বত্র জয়জয়কার অবস্থা। এ যুদ্ধে কাফিরদের সংখ্যা মুসলিমদের চেয়ে কম ছিল। মুসলিমদের সংখ্যা ১৪/১৫ হাজার ছিল। স্বাভাবিক নিয়মেও মুসলিমদের বিজয় হওয়ার কথা; অথচ আল্লাহর সাহায্য পাওয়া তো দূরের কথা, আল্লাহ প্রথমে মুসলমানদেরকে পরাজয় দিয়েছিলেন।

এর একমাত্র কারণ ছিল, মুসলিম বাহিনীর অধিকাংশই আল্লাহর উপর ভরসা করা প্রয়োজনীয় মনে করেনি। তারা ধারণা করেছিল, "আমাদের সংখ্যা কম থাকলেও কাফিররা পরাজিত হয়। সুতরাং এখন সংখ্যায় বেশি থাকা অবস্থায় জয় নিশ্চিত।"

আল্লাহর রাসূল (স) এবং বদর, ওহুদ ও খন্দক যুদ্ধে যারা শরীক ছিলেন, তাঁদের কারো এ ভুল ধারণা হয়নি। বিজয় যুগে নতুন মুসলিমদের মধ্যেই এমন ধারণা করা স্বাভাবিক ছিল। তাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের

www.pathagar.com

প্রথমে পরাজয় দিলেন। কিন্তু রাসূল (স) ও পুরনো মুসলিমদের খাতিরে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ বিজয় দান করলেন।

ثُمَّ أَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَأَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِيْنَ.

"এরপর আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুমিনদের উপর তাঁর পক্ষ থেকে সান্ত্বনা নাযিল করলেন এবং এমন সেনাবাহিনী নাযিল করলেন, যা তোমরা দেখতে পাও না। আর যারা কুফরী করেছিল, তাদেরকে তিনি শাস্তি দিলেন। যারা (সত্যকে) মানতে অস্বীকার করে তাদের জন্য এমন বদলাই রয়েছে।" (সূরা তাওবাহ : ২৬)

একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করা মানে হলো– এ কথা বিশ্বাস করা যে, হক ও বাতিলের সংঘর্ষে আল্লাহ নিরপেক্ষ নন। তিনি হকের পক্ষে সক্রিয়। হকপন্থিদেরকে উপলব্ধি করতে হবে যে, বাতিল শক্তির মুকাবিলায় তাদের সামনে আল্লাহ স্বয়ং রয়েছেন। যেহেতু আল্লাহকে পরাজিত করার ক্ষমতা কারো নেই, সেহেতু হকের বিজয় নিশ্চিত। আল্লাহকে পরাজিত করা সম্ভব হলে বাতিলপন্থি হকপন্থিকে পরাজিত করতে সক্ষম হতো।

৪. যারা ইসলামের পক্ষে সংগ্রাম করছে, তাদের অন্তরে শাহাদাতের খাঁটি জযবা থাকতে হবে। জান বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলার নীতি ইখলাসের পরিচয় বহন করে না। সংগ্রামের ময়দানে শহীদ হওয়ার কামনা নিয়েই লড়তে হবে। শাহাদাতের জযবা মানে মৃত্যুভয় পরিত্যাগ করা। মৃত্যুভয়ই মানুষকে দুর্বল করে। এ ভয় না থাকলে একজন দশ জনকেও পরওয়া করে না।

মৃত্যুভয় চরম বোকামি। আল্লাহ মৃত্যুর জন্য সময় ও স্থান নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। ভয় করে কি রেহাই পাওয়ার উপায় আছে? মৃত্যুই সবচেয়ে নিশ্চিত। তাই শ্রেষ্ঠ মৃত্যুই কাম্য হওয়া মুমিনের সহীহ জযবা। শহীদ হওয়ার খাঁটি জযবা থাকলে স্বাভাবিক মৃত্যু হলেও শাহাদাতের মর্যাদা পাওয়া যাবে বলে রাসূল (স) সুসংবাদ দিয়েছেন। এর পরও যদি কারো মৃত্যুভয় থাকে তাহলে সে চরম নির্বোধ।

হক ও বাতিলের দ্বন্দ্বে হকের বিজয়ের জন্য যে চারটি শর্ত আলোচনা করা হলো তা পূরণ করার দায়িত্ব হকপন্থিদের উপরই ন্যস্ত। এসব শর্ত পূরণ করা ছাড়া আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় কিছুতেই সম্ভব নয়।

ইসলামী শক্তির বিজয় সাধারণ নিয়মে হয় না

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, ক্ষমতার উত্থান-পতন যেসব সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী হয়ে থাকে, তা ইসলামী শক্তির বিজয়ের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। ইসলামের বিজয়ের জন্য ঐ চারটি বিশেষ শর্ত পূরণ না হলে যে সাধারণ নিয়মে অন্যদের বিজয় হয়, সে নিয়মে ইসলামের বিজয় হয় না। তাই সংখ্যায় বেশি হলেও, উন্নত অস্ত্রের অধিকারী হলেও, পরিস্থিতি অনুকূল থাকলেও ঐ চারটি শর্তের কোনো একটির অভাব থাকলে ইসলামী শক্তির বিজয় হতে পারে না।

www.pathagar.com

ইসলামের বিজয়ের প্রাথমিক শর্ত

ইসলামের বিজয়ের প্রাথমিক শর্ত দুটো :

১. আল্লাহর পথে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ (সংগ্রাম) করার উদ্দেশ্যে এমন একদল সুসংগঠিত আল্লাহর সৈনিক প্রয়োজন, যারা আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্য শহীদ হওয়ার আন্তরিক জযবা নিয়ে বাতিলের মুকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত।

কুরআনে নবীগণের যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায়– যে নবীর যুগে এমন এক দল সংগ্রামী সৈনিক যোগাড় হয়নি, সে নবীর হাতে বিজয় আসেনি; অনেক নবীকে শহীদ পর্যন্ত করা হয়েছে। যে নবীর যুগে অল্প কিছু সঙ্গী যোগাড় হলেও বাতিলের মুকাবিলা করার মতো জনশক্তি পাওয়া যায়নি, সে নবীর কাওমকে ধ্বংস করে নবী ও তাঁর সাথীদেরকে রক্ষা করার ব্যবস্থা আল্লাহ করেছেন।

দীনে হককে কায়েম করতে চেষ্টা করলে বাতিল শক্তি অবশ্যই তা প্রতিরোধ করবে। এ কারণেই হকপন্থি ও বাতিলপন্থিদের মধ্যে সংঘর্ষ, দ্বন্দ্ব ও লড়াই অনিবার্য। যদি বাতিল শক্তি মনে করে যে, কোনো ইসলামী শক্তি জেগে উঠেছে– যারা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে, তবেই তারা এর বিরোধিতা করে থাকে। তাই ইসলামের বিজয়ের জন্য প্রথমে প্রয়োজন বাতিল শক্তির বিরোধী একটি ইসলামী শক্তি। যদি এ জাতীয় কোনো সংগঠিত শক্তি থাকে তবেই আল্লাহর সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

২. কোনো ইসলামী শক্তি সংগঠিত হতে থাকলে বাতিল অবশ্য তা দমন করতে চেষ্টা করবে। এ অবস্থায় জনগণ যদি বাতিলের পক্ষে সক্রিয় থাকে তাহলে এ সংগঠন অগ্রসরই হতে পারবে না; বরং সংগঠনকে টিকিয়ে রাখাই অসম্ভব হয়ে পড়বে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর দীনের মহানিয়ামতকে কোনো দেশে জোর করে চাপিয়ে দেন না। জনগণ সমর্থক না হলেও– যদি সক্রিয় বিরোধী না হয় তাহলেও ইসলামী আন্দোলন দানা বাঁধতে পারে। এ ধরনের কোনো জনপদ পাওয়া না গেলেও বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সংগঠিত হওয়ার সুযোগ পাওয়া গেলেই এমন শক্তি গড়ে তোলা সম্ভব।

রাসূল (স) মক্কায় এমন সুযোগ না পেয়ে তায়েফে গেলেন। সেখানে মক্কার চেয়ে খারাপ পরিবেশ ছিল। শেষ পর্যন্ত মদীনায় হিজরত করতে হলো। মদীনায় ইহুদী গোত্রগুলো ইসলাম গ্রহণ না করলেও প্রথমেই বিরোধিতা শুরু করেনি। মদীনায় ইসলামী শক্তি সংগঠিত হওয়ার পরই বাতিলের সাথে সংঘর্ষ হয় ও আল্লাহর সাহায্যে বিজয় আসে।

সারকথা

ইতঃপূর্বে যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে, এর সারকথা হলো :

১. দুনিয়ায় যে ক্ষমতার লড়াই চলছে, তাতে আল্লাহর রচিত শাশ্বত নিয়মেই জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে থাকে। আল্লাহ ঐ নিয়মে সাধারণত হস্তক্ষেপ করেন না। বিশেষ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করলেও তা উপলব্ধি করা বা নিশ্চিতভাবে ব্যাখ্যা করা মানুষের সাধ্যের বাইরে।

www.pathagar.com

২. ইসলামের বিজয়ের ব্যাপারে আল্লাহর দেওয়া সাধারণ বিধি-বিধান মোটেই প্রযোজ্য নয়। কারণ, ইসলাম ও ইসলামবিরোধী শক্তির লড়াইয়ে আল্লাহ্ ইসলামের পক্ষে সক্রিয় থাকেন। একমাত্র আল্লাহর সাহায্যেই ইসলামী শক্তি বিজয়ী হয়।

তবে আল্লাহর সাহায্য পেতে হলে মুসলিম বাহিনীকে ৪টি শর্ত পূরণ করতে হবে। এসব শর্ত পূরণ না হলে সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী তারা বিজয়ের যোগ্য বিবেচিত হলেও আল্লাহ্ তাদেরকে বিজয়ী হতে দেবেন না।

এর আসল কারণটাও বোঝা প্রয়োজন। ঐ চারটি শর্ত যে মুসলিম শক্তির মধ্যে নেই তারা বিজয়ী হলেও তারা আল্লাহর প্রতিনিধির দায়িত্ব পালনের যোগ্য হবে না। তারা আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করার চেয়ে নিজেদের পার্থিব স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত থাকবে।

৩. ইসলাম ও ইসলামবিরোধী শক্তির লড়াই তখনই হবে, যখন ইসলামী শক্তি লড়াই করার জন্য সংগঠিত হতে সক্ষম হবে।

যে দেশে জনগণ ইসলামের সক্রিয় বিরোধী নয়, সে দেশেই ইসলামী শক্তি লড়াই করার জন্য সংগঠিত হওয়ার সুযোগ পায়।

বাংলাদেশে কি ইসলামের বিজয় সম্ভব?

উপরিউক্ত আলোচনার যুক্তিসমূহকে যারা গ্রহণযোগ্য মনে করেন, বাংলাদেশে আল্লাহর রহমতে ইসলামের বিজয় অবশ্যই সম্ভব বলে তারা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন। এ দেশের জনগণ ইসলামবিরোধী নয়। এখানে ইসলামকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে সংগঠন গড়ে তোলার পরিবেশ অনুকূল রয়েছে।

যারা ইসলামকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে সংগঠিত হওয়ার জযবা রাখে তাদের ঐ চারটি শর্ত পূরণের দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে হবে। ঐ শর্ত পূরণ করতে সক্ষম হলে আল্লাহর সাহায্য পাওয়া নিশ্চিত। আর আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার যোগ্য হলে বিজয় অনিবার্য।

নির্বাচনী যুদ্ধে বিজয়ের জন্যও আল্লাহর সাহায্য একইভাবে প্রয়োজন। খালেস নিয়তে সাধ্যমতো যাবতীয় প্রস্তুতি নিয়ে একমাত্র আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভর করে নির্বাচনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে আল্লাহর সাহায্যে বিজয় নিশ্চিত।

প্রতিপক্ষের হুমকি-ধমকিতে যারা ভীত হয়ে ময়দান থেকে পিছিয়ে যায় এবং ভোটকেন্দ্র থেকে পালিয়ে আসে তাদের মধ্যে তো শাহাদাতের জযবাই নেই। এ ধরনের দুর্বলমনা লোকদেরকে আল্লাহ্ সাহায্য করেন না। বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করার হিম্মত যাদের থাকে, তাদেরকেই আল্লাহ্ তাআলা সাহায্য করেন।

আল্লাহ্ তাআলা এ দেশের ইসলামী আন্দোলনকে তাওফীক দিন– যাতে আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য পাওয়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্য ঐ চারটি শর্ত পূরণ করতে সক্ষম হয়। আমীন!

সমাপ্ত

www.pathagar.com

রাষ্ট্রক্ষমতার উত্থান-পতনে আল্লাহ তাআলার ভূমিকা

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড
www.pathagar.com